সুজাত ভদ্র

রাষ্ট্রবিহীন মানুষের চাই
মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকার অধিকার

এই মুহূর্তে অসম অগ্নিগর্ভ। মণিপুরও অগ্নিগর্ভ। ত্রিপুরায় গুলি চলেছে; নিহত হয়েছে কয়েকজন। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সদ্য গৃহীত হয়েছে লোকসভায়। অগপ অসমে বিজেপি পরিচালিত মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে গেছে। হীরেন গোঁহাই-এর মতো বুদ্ধিজীবীরা বিলের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন। রাষ্ট্র অতি ন্যক্কারজনকভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার ধারায় (১২৪ক ভারতীয় দণ্ডবিধি) অভিযুক্ত করেছে। তাঁরা আগাম জামিন পেয়েছেন।

রাষ্ট্রের এই আক্রমণ নিন্দাজনক। দেশে দেশে যে দেশদ্রোহিতার ধারা ও ফৌজদারী শাস্তির ব্যবস্থাপনা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে স্থান পেয়েছে, তা ভারতবর্ষে আজও বহাল এবং গত কয়েক বছর ধরে সমস্ত ভিন্নমতের বিরুদ্ধে লাগাতারভাবে ব্যবহার করে আসছে। এবং দেশদ্রোহিতার ধারার প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে বেআইনী ও অসাংবিধানিক। ব্রিটিশ যুগের শেষবেলায় তিলকের মামলায়, অথবা সদাশিব নারায়ণের মামলায় প্রিভিকাউন্সিল দেশদ্রোহিতার অন্যতম উপাদান হিসাবে "disaffection"-কে যুক্ত করে; যার অর্থ ছিল সরকারের বিরুদ্ধে মন্দ মনোভাব প্রকাশ করলেই দেশদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারবে সরকার। ১৯৬২ সালে কেদারনাথ মামলার রায়ে স্বাধীন ভারতের সুপ্রীম কোর্ট প্রিভিকাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে খারিজ করেন এবং শুধুমাত্র "হিংসাত্মক ঘটনা" ঘটানোর জন্য ইন্ধন জোগালে (inciterent) এই ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে, নতুবা নয়। পরবর্তীকালে বলবন্ত সিং মামলায় বা অরূপ ভুঁইয়া বা ইন্দ্রদাসের মামলায় সুপ্রীম কোর্ট দেশদ্রোহিতার বিচারে একই মানদণ্ড বজায় রেখেছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬ক ধারা সুপ্রীম কোর্টে বাতিল হয়ে যাওয়ার পরে (শ্রেয়া সিংহলের মামলায়) আজও সরকার এই ধারা প্রয়োগ করে নাগরিকদের হেনস্থা করছে। সুপ্রীম কোর্ট সম্প্রতি সেই সব আধিকারিকের কাছ থেকে জবাবদিহি চেয়েছেন। তেমনি কেদার নাথ রায়কে (১৯৬২) বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে প্রশাসনিক আধিকারিকরা ১২৪ক ধারা যেভাবে প্রয়োগ করে যাচ্ছেন, তা চিরতরে বন্ধ হওয়া উচিত, তার জন্য সুপ্রীম কোর্টের একইভাবে জবাবদিহি চাওয়া উচিত।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আসামের বুদ্ধিজীবীরা, প্রায় ৭০টি উপজাতি সংগঠন, মুসলিম অধিকার রক্ষায় রত বলে দাবীদার AIUDF প্রতিবাদ জানাচ্ছে যে ২০১৮ সালের নাগরিক সংশোধনী বিল বাতিলের দাবীতে তার কারণ কী? বিরোধের জায়গা কোথায় কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে?

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আনীত ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইনের সংশোধনী ধর্মের উপর ভিত্তি করে নাগরিকত্ব দেওয়া বা না দেওয়ার প্রশ্নটি নির্ধারিত করেছে। অতি সম্প্রতি শিলচরে (জানুয়ারি ২০১৯ সালে) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অসমের বিজেপি নেতাদের (বিশেষ করে হিমন্ত বিশ্বশর্মা) বক্তব্যের দুটি উদ্দেশ্য পরিষ্কার : এক, ভারত বিভাজনের "ভুলকে" ঠিক করা। কী ভুল হয়েছিল? ভারতকে 'হিন্দু জাতি রাষ্ট্রে" তখন রূপান্তরিত করা যায়নি। অতএব যেহেতু উপমহাদেশে নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা যাবতীয়

হিন্দুদের বাসস্থান হবে ভারতবর্ষ। এবং, দুই, প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যেহেতু দুটি রাষ্ট্র আছে সেহেতু তাদের ভারত থেকে তাড়াতে হবে, সেখানে পাঠিয়ে দিতে হবে।

এই তত্ত্বায়নকে বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যবহারিক স্তরে দুটি মানদণ্ড স্থির করেছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার : হিন্দু নামধারী যে কোনও ব্যক্তিমাত্রই শরণার্থী; অতএব ভারতে আশ্রয় সহ নাগরিকত্বের সমস্ত সুবিধা পাবে; তার বৈধ কাগজপত্র থাকার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। হিন্দুদের প্রশ্নে জাতি, রাষ্ট্রের সীমানা, সীমান্তের নজরদারি, এদেশে প্রবেশ সংক্রান্ত কাগজপত্র – সবই অবান্তর।

মনে রাখতে হবে, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালেই দুটি প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৯৪৬ সালে Foreigners Act এবং ১৯২০ সালের পাসপোর্ট আইন সংশোধন করেছে এবং তাতে বলা আছে, তিনটি দেশ থেকে আগত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী ও খ্রিস্টানদের এদেশে থাকা/বসবাস করা সংক্রান্ত কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখানোর দরকার নেই। বসবাস করার অধিকার থাকবে কোনও বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও।

সে নিয়ে কোনও প্রতিবাদ তখন কেউ জানায়নি। সেই বিজ্ঞপ্তি আজও বহাল আছে। বিপরীতে, মুসলমান সম্প্রদায়যুক্ত ব্যক্তিমাত্রই "অনুপ্রবেশকারী" এবং "প্যান-ইসলামিক" বানানোর ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ এই "অনুপ্রবেশকারী" ব্যক্তিরা। এই প্রশ্নেও বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার দুমুখী নীতি গ্রহণ করেছে : স্বদেশে উচ্চবর্ণের মধ্যে আর্থিকভাবে অনুন্নতদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে গরীব মুসলমানও যে কাজের সন্ধানে সীমান্ত পেরোতে পারে, তাকে অস্বীকার করছে; এমনকী ধর্মের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েও চলে আসতে পারে তাও অস্বীকার করছে। ধর্মের এই কষ্টিপাথরে তাই রোহিঙ্গারাও শরণার্থী হতে পারেনি; বরং, তারা "সন্ত্রাসবাদী" তকমা পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত Declaration of Territorial Asylum-এ ভারত স্বাক্ষর করেছিল। সেই ঘোষণা অনুযায়ী, রোহিঙ্গারা এদেশে শরণার্থী স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারী। সামগ্রিকভাবে এই তত্ত্বায়ন তাই একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে "সন্ত্রাসবাদী সম্প্রদায়" হিসাবেই বিবেচনা করে, যেমন ব্রিটিশরা এক একটি উপজাতিকে "ক্রিমিনাল/অপরাধী" উপজাতি হিসাবে তকমা দিয়ে এসেছিল। বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি সর্বত্র জনসভায় বলছেন, "অনুপ্রবেশকারী" সবাইকে উইপোকা, তাদের এক এক করে টিপে মেরে ফেলতে হবে। হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলছেন, অসম থেকে জিন্নাদের তাড়াতেই হবে; অসমের ১৪টি বিধানসভা আসন জিন্নাদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে (TOI, Jan 9, 2019)।

এই "জুমলা" সম্ভাব্য গণহত্যার ভাষা; তার পদধ্বনি ইতিমধ্যেই শোনা গেছে যখন নিরীহ শ্রমজীবী বাংলাভাষী কয়েকজনকে সম্প্রতি হত্যা করা হয়েছে।

লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং, Open ম্যাগাজিনে (২৪.৯.২০১৮) বিজেপি'র জাতীয় সম্পাদক তথা আরএসএস-এর তাত্ত্বিক রাম মাধব নেহেরুর উদ্ধৃতি দিয়ে দাবী করেছেন, নেহেরু নাকি হিন্দুদের শরণার্থী ও মুসলমানদের "অনুপ্রবেশকারী" হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন ও উৎপীড়িত হিন্দুদের ভারতে স্থান দেওয়ার জন্য সওয়াল করেছিলেন; বিজেপি নেহেরুরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে মাত্র। কিন্তু প্রশ্ন হল, নেহেরু এ জাতীয় বিভাজন করেছিলেন কিনা? মাধব কর্তৃক ব্যবহৃত নেহেরুর উক্তির কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা? ১৯৫০ সালে ১৫ নভেম্বর শরণার্থী ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে নেহেরুর বক্তব্য ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নেহেরুর বক্তৃতার দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যায় (পৃ: ৮-১০)। তাতে কোথাও হিন্দুদের জন্য শুধু শরণার্থী স্থিতি দেওয়া হোক নেই। ধর্মনিরপেক্ষভাবে "displaced persons" ভাবনা আছে; হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দুর্দশার কথা বলা আছে; প্রয়োজনে আইন পরিবর্তনের কথা বলা আছে। নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলা আছে।

বদরুদ্দীন আজমলের নেতৃত্বাধীন AIUDF নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের সর্বাত্মক বিরোধিতা করছে। তাঁর উদ্দেশ্য, মুসলিম সম্প্রদায়কে যাতে বাদ দিতে না পারে।

কিন্তু অসমে সক্রিয় সমস্ত বিরোধী দলের বিরোধিতা এই কারণে নয় যে, বাংলাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েক লক্ষ মানুষ নাগরিকত্ব হারাচ্ছেন। তাদের দাবি, ধর্ম নির্বিশেষে "বিদেশী" সবাই (১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকে ভিত্তি করে) অসম থেকে বিতাড়ন করতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাভাষী হিন্দুকে নাগরিকত্ব দেওয়া চলবে না। অসমের সংস্কৃতি, সত্ত তাহলে আর রক্ষা করা যাবে না।

মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটো অবস্থানই মানবতা বিরোধী। এমনিতে, ভারতবর্ষ ১৯৫১ ও ১৯৫৪ সালের রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা গৃহীত শরণার্থী সংক্রান্ত কনভেনশনে স্বাক্ষর করেনি; শরণার্থী নীতিও নেই। রাজনৈতিক সমীকরণের ভিত্তিতে ভারত রাষ্ট্র কখনও কখনও শরণার্থী মর্যাদা দেয়, যেমন তিব্বতীদের, শ্রীলঙ্কার তামিলদের।

সংবিধান স্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষতাকে মেনে যারা ক্ষমতায় এসেছেন, তারা বিশেষ জনগোষ্ঠীকে ধর্মের ভিত্তিতে প্রাধান্য দিতে পারেন কিনা অথবা বিতাড়ন করতে পারেন কিনা? উত্তর : না। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সংশোধনী তাই পুরোপুরিভাবে একটি সম্প্রদায়কে "অপর", "শত্রু", "অশুভ" হিসাবে দেখছে এবং আরেকটি সম্প্রদায়কে তার নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে চিহ্নিত করছে, তারই সম্প্রসারিত অংশ হিসাবে বিবেচনা করছে, সেইভাবে জাতি-রাষ্ট্র গঠন করতে চাইছে। এই ভাবনা, Horowitz-এর মত অনুসারে আসলে সৃষ্টি করতে চাইছে "Socially Preferential Endogamy and Physically by Territoriality"; বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের যাবতীয় হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্শী এবং খ্রীস্টানরা ভারতে ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে থাকতে চাইলে স্বাগত জানাবে ভারত রাষ্ট্র এবং নাগরিকত্ব পাবে। এই ভাবনা ও নীতি বর্ণবৈষম্যবাদ, ফ্যাসিস্ট এবং সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রতিফলন, যা কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োগ করছে।

বিপরীতে, এনআরসি'কে হাতিয়ার করে অসমীয়া জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সত্ত্বাকে রক্ষা করার দাবি তুলে একইভাবে "Socially Endogamy"-র তত্ত্বকেই বাস্তবায়িত করছে এবং এক মানবতাবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করছে।

নাগরিকত্বের ধারণার মধ্যেও যে "multicultural citizenship"-এর ধারণা থাকতে পারে তাকে উভয়েই নস্যাৎ করছে। উভয়েই আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত নাগরিকত্বের ধারণাকে অস্বীকার করে আসছে; এবং এমনকি ১৯৫৫ সালে ভারতের নাগরিকত্ব আইনের মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

এই আইন অনুযায়ী, জন্মগত অধিকার, দীর্ঘদিন থাকার সুবাদে এবং স্বাভাবিকত্ব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভ করা যেতে পারে। অসম চুক্তির পরবর্তীকালে এই আইন সংশোধিত হয় ১৯৮৫ সালে; ৬ক ধারা সংযোজিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকে সীমারেখা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে "legacy data" বা পূর্বপুরুষের অসমে বসবাস বা নাগরিকত্বের ঠিকুজি কুষ্ঠি যাচাই এই অভূতপূর্ব সমস্যার সৃষ্টি করেছে। "Blood relation"/রক্ত সম্পর্কই মূল ও একমাত্র মাপকাঠি নাগরিকত্বের সংজ্ঞাকেই গুণগতভাবে বদলে দিয়েছে। সেই "Socially Endogamy" ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করছে। বিজেপি'র প্রস্তাবিত সংশোধনী একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের বিপন্ন করে তুলবে। বিরোধীদের বিরোধিতা প্রায় ৪০ লক্ষকে রাষ্ট্রবিহীন, নাগরিকত্বহীন করে তুলবে। বিজেপি'র কাছে মূলত হিন্দু জনজাতি যদি "বিদেশী"ও হয়, কিন্তু যদি বিপন্ন হয় তাহলে তাকে রক্ষা; বিরোধীদের বক্তব্য অসমীয়াসত্তার জন্য সমস্ত ধরনের বিদেশী (হিন্দু-মুসলমান সহ সব ধর্ম নির্বিশেষে) বিতাড়নই একমাত্র পথ।

এই বিরোধ কীভাবে মীমাংসা/নিষ্পত্তি হবে, নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না এখনি। বিজেপি'র দাবি জিতলে, বিতাড়নের জন্য টার্গেট সংখ্যা কমবে; বিরোধীদের দাবি জিতলে, টার্গেটের সংখ্যা বিপুল হবে – প্রায় ৪৫ লক্ষের কাছাকাছি।

এত লক্ষ মানুষকে বিতাড়ন করা হবে কী করে? সোনওয়াল মামলায় সুপ্রীম কোর্ট বলেছেন, আন্তর্জাতিক সনদ মেনে বিতাড়ন করতে হবে; অর্থাৎ এই তথাকথিত "বাংলাদেশীদের" বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিতে চাইলে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করে সমাধান বার করতে হবে।

কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারত সরকার এই জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কথা বলার জন্য কোনও দাবি করেনি। এমনকি ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদী বাংলাদেশ সফরে এই নিয়ে আলোচনা করেননি বলে সংবাদে প্রকাশ। দু' দেশের যৌথ বিবৃতিতেও এই নিয়ে কোনও শব্দ ব্যয় করা হয়নি। বাংলাদেশও এক হাজারের কিছু বেশি বাংলাদেশের নাগরিক ভারতে "অবৈধভাবে" আছে বলে স্বীকার করেছে। ৪০ লক্ষের কোনো গল্প নেই। এইসব এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বাংলাদেশ সযত্নে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। উপরন্তু এনআরসি'র বাইরে রয়েছেন কয়েক হাজার মানুষও তাদের পরিবার; যারা ডি ভোটার/সন্দেহজনক ভোটারের দাগ পেয়েছেন, যারা বিদেশী বলে চিহ্নিত হয়েছেন ট্রাইবুনাল দ্বারা, এবং রয়েছেন হাজার হাজার মানুষ যাদের বিচার চলছে ট্রাইবুনালে বিদেশী কিনা নির্ণয়ের জন্য। এই তিন ক্যাটাগরির/বর্গের মানুষ এনআরসি'তে আবেদন করার যোগ্য নন। তাদের অনেকে ৬টি detention centre-এ নরকের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছেন।

অ-বিজেপি বিতাড়নকারী সংগঠনগুলো বহু বছর ধরে বলে আসছে, ৫০ লক্ষ মতো মানুষ বিদেশী বা বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধভাবে বিতাড়ন যদি না করা যায় তাহলে কী হবে? অনেকের বক্তব্য, বিতাড়ন করা অসম্ভব। "work permit" দিয়ে রেখে দেওয়া। অন্যান্য দেশে নাকি এরকম চালু আছে; তা অসমেও চালু করা সম্ভব। অর্থাৎ নাগরিকত্ব হারাবেন এরা; অধিকারহীনতা সহ এক শ্রমজীবী বাহিনী হিসাবে অসমে থাকবে; পরিশীলিত আধুনিক ক্রীতদাসত্বের ব্যবস্থা চালু হবে। তাদের বংশধররাও পরম্পরাগত এই ব্যবস্থার অংশ হিসাবে থাকবে।।

আমরা জানি না, অন্য কোনও দেশে, নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বা হয়েছে "retrospective"ভাবে। ২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে আজ ২০১৯-এর জানুয়ারি – এই ৪৭ বছর ধরে যারা অসমে থেকেছেন, জন্মেছেন, যাদের কোনও শিকড় বাংলাদেশে নেই, যারা নাগরিকত্ব ভোগ করছেন, হঠাৎ আইনি coercive পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে রাষ্ট্রবিহীন মানুষে রূপান্তরিত করে দেওয়া হচ্ছে। এর কোনও নিদর্শন আর কোথাও আছে?

দুই, অনিন্দিতা দাশগুপ্ত সহ অনেকে তথ্যপ্রমাণ সহ দেখিয়েছেন, ৫০ লক্ষের মতো বাংলাদেশী অসমে এসেছে বেআইনীভাবে, তা মিথ। তার কোনও উত্তর দিতে পারেনি আন্দোলনকারীরা।

তিন, এরা দু ধরনের যুক্তি সমান্তরালভাবে দিচ্ছেন। এনাদের দাবির ভিত্তিতে, অসম চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধিত হয়ে ৬ক ধারা যুক্ত হল শুধুমাত্র অসমের জন্য। বিদেশী চিহ্নিতকরণের জন্য বিশেষভাবে রচিত IMDT আইন ১৯৮৩ সালে চালু হল। কিন্তু আবার যখন দেখা গেল, IMDT-র মাধ্যমে মাত্র দু হাজার মতো মানুষকে "বাংলাদেশী" বলে চিহ্নিত করা যাচ্ছে, তখন তারা অসমের জন্য কেন বিশেষ আইনের ধুয়া তুলে ১৯৪৬ সালের বিদেশী আইন প্রয়োগের দাবি তুললেন, সুপ্রীম কোর্ট মেনে নিলেন এবং আইনী lethal power-কে ব্যবহার করে বিদেশী চিহ্নিতকরণ করে তাদের কাঙ্খিত সংখ্যায় পৌঁছোলেন।

অসমের জাতিসত্তার রক্ষা এবং কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে রক্ষা সংক্রান্ত যে মূল বক্তব্য তা নিয়েও গভীর সংশয় প্রকাশ করা উচিত।

প্রথমত, কোন জাতিসত্তা, তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এত exclusive এবং closed হয় নাকি? অসমের ইতিহাসও বৈচিত্রময়। ব্রিটিশ যুগ থেকে অভিবাসন ও পাকাপাকি স্থিতি যে কোনও সংস্কৃতির মতো অসমীয়া সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছে ও হয়েছে। তাকে exclusionary যুক্তি দিয়ে আজ এত শতক পরে "খাঁটি", "বিশুদ্ধ" অসমীয়া সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করা সম্ভব নাকি ঐতিহাসিকভাবে? এতো নাৎসীদের "বিশুদ্ধতার" কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনির মতো শোনাচ্ছে। অসমে "ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ" কীভাবে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার ধারণায় পুষ্ট হয়ে mass hysteria-য় রূপান্তরিত হয়, অসম তার প্রমাণ।

দ্বিতীয়, অসমিয়া সংস্কৃতি ও সত্তা বলতেই বা কী বোঝায় আজ? অসমিয়াভাষী অসমবাসীরাই কি অসমিয়া সংস্কৃতির ও সত্তার একমাত্র রূপ? ১৯৮৬ সালে অগপ সরকার যখন অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যের মুখ্য ভাষা হিসাবে ঘোষণা করে, তখন সমস্ত উপজাতি জনগোষ্ঠী (মোট ১১ ধরনের

জনগোষ্ঠী) প্রতিবাদ জানিয়েছিল; প্রত্যেক জনজাতি গোষ্ঠীরই সত্তার স্বীকৃতি ও স্বায়ত্বশাসনের দাবী আছে। অগপ'র পরিকল্পনা আছে, অরুণাচল প্রদেশের মত অসমকে উপজাতি রাজ্য ঘোষণা করে অ-উপজাতিদের ভোটাধিকার থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া, Agampem-এর ধারণা "denizen"-এর ধারণার প্রতিফলন ঘটানো। বোড়ো ও অন্যান্যরা এই পরিকল্পনায় তীব্র আপত্তি জানিয়েছে এবং অসমিয়া ভাষাভাষীদের উপজাতি হিসাবে গণ্য করার পরিকল্পনাকে নাকচ করেছে। দ্রষ্টব্য : Sanjib Baruah : Durable Disorder : Understanding the Policies of North East India, (Oxford, 2007, pp 202).

এটা ঠিক, এশিয়া সহ সর্বত্র যে কোনও দেশের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী, স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য আছে, যা এড়ানো যাবে না। আবার, অভিবাসন এবং স্বাভাবিকত্বকরণের প্রক্রিয়া প্রায়শই এই জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, নমনীয়তার দাবি তুলেছে, আরও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে সমস্যার সমাধানের কথা বলেছে। আওয়াজ উঠেছে তাই : "No one is illegal"।

এটাও উল্লেখ্য, উপমহাদেশের ইতিহাসের অভিনব বৈশিষ্ট্য আছে – দু'বার দেশ ভাগ এবং রাষ্ট্রনৈতিক তথা রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে; "বাংলাদেশ" গঠনের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভাজন উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া। চলে আসা মানুষেরা কিন্তু অবিভক্ত ভারতেরই লোক, উপমহাদেশের লোক। সীমানা, জাতিরাষ্ট্র তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

এ কথা প্রশ্নাতীতভাবে বলা যায়, তথাকথিত বিদেশী বলে চিহ্নিত করা যাদের হয়েছে, তাদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১৫ লঙ্ঘন করেই করা হয়েছে; অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, কাউকে arbitrarily জাতীয়তা কাড়া যাবে না।

Work permit দিয়ে রেখে দেওয়ার অর্থ, তাকে স্বতন্ত্র করে রাখা, ঘেটোর মধ্যে রাখা, ট্রেসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া এবং নাগরিকের যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে ১৯৫৪ সালের "রাষ্ট্রবিহীন মানুষ সংক্রান্ত" কনভেনশন বিরোধী এবং ১৯৬১ সালের রাষ্ট্রবিহীন মানুষের সংখ্যা হ্রাস করা সংক্রান্ত কনভেনশনেরও বিরোধী।

অভিবাসন পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নয়। জাতীয়তাবাদের যুগেই ব্যাপক অভিবাসন হয়েছে। দেশে দেশে তাই শরণার্থী নীতিও গড়ে উঠেছে। বর্তমানে সিরিয়া সংকটের প্রেক্ষিতে শরণার্থীর মিছিল দেশে দেশে নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে। নানা দেশের মানুষ শরণার্থীকে বরণ করারও আন্দোলন করছেন। সরকার কঠোর হচ্ছে ও তার বিরোধিতা হচ্ছে। কিন্তু প্রায় ৪৭ বছর পর লক্ষ লক্ষ মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার পক্ষে "গণ আন্দোলনের" নজির বোধ হয় পৃথিবীতে নেই।

এখন প্রশ্ন হল, নাগরিকত্ব হারানো, রাষ্ট্রবিহীন মানুষদের ভবিষ্যৎ কী হবে? মার্টিন বুবের (Buber) বলেছেন, এদের স্থিতি হবে "present absentee"-এর মতো। এই জাতীয় রাষ্ট্রহীনতার কী ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে তা Hannah Arendt ১৯৪০-এর দশকে বলে গেছেন। তাঁর ভাষায় : "To be stripped of citizenship is to be stripped of worldliness; it is like returning to a wilderness as cavemen or savages... A man who is nothing but a man has lost the very qualities which make it possible for other peoples to treat him as a fellow man... they could live and die without leaving any trace, without having contributed anything to the common world." (The origins of Totalitarianism)

একইভাবে রাষ্ট্রবিহীনতার সঙ্গে মানুষ হিসাবে অসহায়ত্ব কীভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে, তার অনুভূতি রাষ্ট্রসংঘের একটি দলিলে আছে। একজন রাষ্ট্রবিহীন নারী বলছেন মর্মস্পর্শী ভাষায় :

"Being said 'No' to by the country where I live, being said 'No' to by the country where I was born ... or hearing from you do not belong to us 'continuously', I feel I am nobody ... Being stateless, you are always surrounded by a sense of worthlessness."

রাষ্ট্রহীনতার তাই দুটি দিক : (১) নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের আইনী স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যাওয়া; এবং (২) যাবতীয় আইনী ও সাংবিধানিক অধিকার হীনতার স্তরে নামিয়ে দেওয়া।

আমরা আমাদের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় এবং ইতিহাসে দেখেছি, উপমহাদেশে ন্যায়বিচার পাওয়া দুর্লভ বস্তু; নাগরিকদেরই ন্যায়বিচার পেতে জীবন পেরিয়ে যায়, ন্যায়বিচার মেলে না। সেখানে, নাগরিক অধিকার হারানো মানুষের কোনও বিচারই হবে না তা নতুন করে বলার বোধ হয় দরকার নেই। অসম আস্তে আস্তে ethnic killing field-এ রূপান্তরিত হবে; বারবার নেলীর মতো গণহত্যার ঘটনার সাক্ষী থাকতে হবে আমাদের।

আইনের মোড়কে এই বলপূর্বক বিভাজনের বিরুদ্ধে, অপদার্থ, অধিকারবিহীন মানুষে রূপান্তরিত করার রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে Hannah Arendt আওয়াজ তুলেছিলেন। Hannah Arendt বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রবিহীন মানুষের থাকবে "the right to have rights"। রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী সংক্রান্ত কমিশনার সম্প্রতি সমস্ত দেশের সাংসদের জন্য একটি হ্যান্ডবুক প্রকাশ করেছেন। সেই দলিলের নাম Nationality and Statelessness : A Handbook for Parliamentarians। তাতে Hannah Arendt-এর উক্ত আওয়াজকে স্বীকৃতি দিয়ে দাবী তোলা হয়েছে, "রাষ্ট্রবিহীন" মানুষদের (de jure বা de facto – যাই হোক) সমস্ত নাগরিক অধিকার, সুযোগ সুবিধা, স্বাধীনতা দিতে হবে; দ্বিতীয় স্তরের মানুষ হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

ভারতে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে স্বাভাবিককরণের বিধান আছে। তাকে প্রয়োগ করে এদের স্বাভাবিককরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকত্ব দিতে হবে – এটাই একমাত্র মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন পথ।

সার্বভৌমত্ব, জাতিরাষ্ট্র, সীমানা, নাগরিকত্বের অধিকারের সঙ্গে যদি মানবতার সংঘাত বাধে, তাহলে মানবতাই প্রাধান্য পাবে, নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে সেই মানবতাই মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে।